রাহে বেলায়াত

বিভাগ/অধ্যায়ঃ প্রথম অধ্যায় - বেলায়াত ও যিকর

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

জ. মাসনূন যিকরের শ্রেণীবিভাগ - ৭. দু‘আ বা প্রার্থনা বিষয়ক বাক্যাদি - (খ) দু‘আর সুন্নাত-সম্মত নিয়ম ও আদব - নবম ভাগ

যিকর নং ২৬ : তাশাহহুদের পরের দু‘আ :

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস’ঊদ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে তাশাহহুদের পরে দু‘আর কিছু বাক্য শিখিয়েছেনঃ

اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمِكَ مُثْنِينَ بِهَا عَلَيْكَ قَابِلِينَ لَهَا وَأَتِمِمْهَا عَلَيْنَا

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আল্লিফ বাইনা কুলুবিনা ওয়া আসলি’হ যা-তা বাইনিনা, ওয়াহদিনা- সুবুলাস সালা-ম, ওয়া নাজ্জিনা- মিনায যুলুমা-তি ইলান নূর। ওয়া জান্নিবনাল ফাওয়া-’’হিশা মা যাহারা মিনহা- ওয়া মা- বাতান। ওয়া বা-রিক লানা- ফী আসমা-‘ইনা-, ওয়া আবসা-রিনা-, ওয়া কুলুবিনা-, ওয়া আযওয়া-জিনা, ওয়া যুররিয়্যা-তিনা-। ওয়া তুব ‘আলাইনা-, ইন্নাকা আনতাত তাওয়া-বুর রাহীম। ওয়াজ্ ‘আলনা- শা- কিরীনা লিনি’মাতিকা, মুসনীনা বিহা-কাবিলীহা, ওয়া আতমিমহা- ‘আলাইনা-।

অর্থঃ “হে আল্লাহ, আপনি আমাদের অন্তরের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিন। আপনি আমাদের মধ্যে সুসম্পর্ক ও সৌহার্দ প্রদান করুন। আপনি আমাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করুন, আমাদেরকে অন্ধকার থেকে মুক্ত করে আলোয় নিয়ে আসুন, আমাদেরকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করুন। আপনি আমাদের শ্রবণযন্ত্রে, আমাদের

দৃষ্টিশক্তিতে, আমাদের অন্তরে, আমাদের দাম্পত্য সঙ্গীগণের মধ্যে এবং আমাদের সন্তানগণের মধ্যে বরকত প্রদান করুন। আপনি আমাদের তওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি তওবা কবুলকারী পরম করুণাময়। আপনি আমাদেরকে আপনার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়ের, নিয়ামতের জন্য আপনার প্রশংসা করার এবং নিয়ামতকে সসম্মানে গ্রহণ করার তাওফীক প্রদান করুন এবং আপনি আমাদের জন্য প্রদত্ত আপনার নিয়ামতকে পূর্ণ করুন।” হাদীসটি সহীহ।[1]

এ সময়ে পাঠের জন্য অনেক দু‘আ সুন্নাতে নববীতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এসকল মাসনূন দু‘আ শিক্ষা করে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে তদ্দ্বারা দু‘আ করা আমদের কর্তব্য। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সালাতের মধ্যে মাসনুন দু‘আর অর্থের কাছাকাছি শব্দে দু‘আ করার অনুমতি প্রদান করেছেন। কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফে যে সকল দু‘আ আছে সবই সালাতের মধ্যে পাঠ করা যায়। এ সকল দু‘আর অর্থবোধক কাছাকাছি শব্দেও দু‘আ করা

যায়।[2] তবে নবুয়্যতের নূর রয়েছে মাসনূন দু'আর মধ্যে। এ সকল নববী দু'আ অর্থ বুঝে হুবহু মুখস্থ করে তা দিয়ে দু'আ করা খুবই প্রয়োজন।

বিতিরের শেষে কুনুতের দু'আ

কুনুত শব্দের অর্থ আনুগত্য, দন্ডায়মান হওয়া, প্রার্থনা করা বা দন্ডায়মান অবস্থায় দু'আ করা। সালাতের মধ্যে দু'আর অন্যতম মাসনূন সময় বিতিরের সালাতের কুনুত। বিতির সালাতের শেষ রাক'আতে রুকুর আগে রাসূলুল্লাহ (সা.) দু'আ পাঠ করতেন, যা কুনুত বা দু'আ কুনুত নামে পরিচিত। এ সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন দু'আ পাঠ করেছেন। আমাদের সমাজে 'দু'আ কুনুত' নামে পরিচিত দু'আটিও সহীহ সনদে বর্ণিত।[3] কিন্তু আমরা অজ্ঞতাবশত মনে করি যে, আমাদের মাযহাব অনুসারে কুনুতের সময় এই দু'আটিই পাঠ করতে হবে, অন্য কোনো দু'আ পাঠ করা যাবে না। ধারণাটি ভুল। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও তাঁর সঙ্গীদ্বয় স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, কুনুতের জন্য কোনো দু'আ নেই, কোনো দু'আ নির্দিষ্ট করা যাবে না। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (রহ) তাঁর "আল-মাবসূত" গ্রন্থে লিখেছেনঃ

قلت فما مقدار القيام فى القنوت قال كان يقال مقدار إذا السماء انشقت والسماء ذات البروج قلت فهل فيه دعاء موقوت قال لا

"আমি বললামঃ তাহলে কুনুতে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দু'আ পাঠ করতে হবে? তিনি বললেন, বলা হতো যে, সূরা 'ইযাস সামাউন শাক্কাত' ও সূরা 'ওয়াস সামাই যাতিল বুরুজ' পরিমাণ। আমি বললামঃ কুনুতের জন্য কি কোনো নির্দিষ্ট দু'আ আছে? বা কোনো দু'আ নির্দিষ্ট করা যাবে? তিনি বললেনঃ না।"[4]

ইমাম মুহাম্মাদের অন্য গ্রন্থ "আল-হুজ্জাত"-এ তিনি লিখেছেনঃ

قلت فهل القنوت كلام موقت قال لا ولكن تحمد الله وتصلى على النبى صلى الله عليه وآله وسلم وتدعوا بما بدا لك

"আমি বললামঃ তাহলে কুনুতের জন্য কি কোনো নির্ধারিত বাক্য বলতে হবে বা কোনো বাক্য নির্ধারিত করা যাবে? তিন বললেনঃ না। বরং তুমি আল্লাহর হামদ বা প্রশংসা করবে, নবীয়ে আকরাম (সা.)-এর উপর সালাত (দরুদ) পাঠ করবে এবং তোমার সুবিধা ও ইচ্ছামতো যে কোনো দু'আ করবে।"[5]

যিকর নং ২৭ : কুনুতের দ্বিতীয় মাসনূন দু'আ

বিতরের কুনুত হিসাবে দুটি মাসনূন দু'আ সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত। একটি "আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাঈনুকা..." যা আমাদের দেশের সকল ধার্মিক মুসলিমের মুখস্থ। দ্বিতীয় দু'আটি সম্পর্কে ইমাম হাসান বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে নিম্নের বাক্যগুলি শিক্ষা দিয়েছেন বিতিরের সালাতে বলার জন্যঃ

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ (وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ) تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাহ্ দিনী ফীমান হাদাইতা, ওয়া ‘আ-ফিনী ফীমান ‘আ-ফাইতা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইতা, ওয়া বা-রিক লী ফীমা- আ‘অ্ তাইতা, ওয়া ক্বিনী শাররা মা ক্বাদ্বাইতা, ফাইন্নাকা তাক্বদ্বী, ওয়ালা- ইউক্বদ্বা ‘আলাইকা, ইন্নাহু লা- ইয়াযিল্লু মান ওয়া-লাইতা, [ওয়ালা- ইয়া‘ইয্যু মান ‘আ-দাইতা] , তাবা-রাক্তা রাব্বানা- ওয়া তা‘আ-লাইতা।

অর্থঃ “হে আল্লাহ, আমাকে হেদায়েত দান করুন, যাদেরকে আপনি হেদায়েত করেছেন তাদের সাথে। আমাকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ও সুস্থতা দান করুন, যাদেরকে আপনি নিরাপত্তা দান করেছেন তাদের সাথে। আমাকে ওলী হিসাবে গ্রহণ করুন (আমার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করুন), যাদেরকে আপনি ওলী হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাদের সাথে। আপনি আমাকে যা কিছু প্রদান করেছেন তাতে বরকত প্রদান করুন। আপনি যা কিছু আমার ভাগ্যে নির্ধারণ করেছেন তার অকল্যাণ থেকে আমাকে রক্ষা করুন। কারণ আপনিই তো ভাগ্য নির্ধারণ করেন, আপনার বিষয় কেউ নির্ধারণ করে দিতে পারে না। আপনি যাকে ওলী হিসাবে গ্রহণ করেছেন সে অপমানিত হবে না। আর আপনি যাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ করেছেন সে কখনো সম্মানিত হবে না। মহামহিমান্বিত বরকতময় আপনি, হে আমাদের প্রভু, মহামর্যাদাময় ও সর্বোচ্চ আপনি।”[6]

আমরা কখনো এই দু‘আ ও কখনো প্রচলিত দু‘আ পড়ব। আমরা দেখেছি যে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এই সময়ে যে কোনো বিষয়ে দু‘আ চাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তবে মাসনূন দু‘আ পাঠের চেষ্টা করতে হবে। এই দুটি কুনুতের দু‘আ ছাড়াও অন্যান্য মাসনূন দু‘আ, যেমন এই বইয়ে উল্লেখিত ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৪, ২৫ ও ২৬ নং যিকর বা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত যে কোনো দু‘আ আমরা মুখস্থ করে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এ সময়ে পাঠ করতে পারি।

আমি “এহ্ইয়াউস সুনান” গ্রন্থে[7] উল্লেখ করেছি যে, হানাফী মাযহাবের ইমামগণ কুনিতের জন্য, এবং সালাতের মধ্যে যে কোনো স্থানে দু‘আর জন্য কোনো দু‘আ নির্দিষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। কারণ এতে দু‘আর প্রাণ থাকে না। মুসুল্লী ঠোঁটস্থভাবে অমনোযোগের সাথে সালাতের যিকর ও দু‘আ আউড়ে যান। এক পর্যায়ে এভাবে প্রাণহীন সালাত শেষ হয়ে যায়। সর্বদা একটি নির্ধারিত দু‘আ পাঠ করলে সালাতের খুশু, আবেগ, প্রাণবন্ততা বিনয় ও আকুতি নষ্ট হয়ে যায়। প্রত্যেক মুমিনের উচিত বিভিন্ন মাসনূন শব্দের দু‘আ অর্থ বুঝে মুখস্থ করে একেক সময় একেক দু‘আ পাঠ করা। এতে মনের আবেগ দিয়ে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে খুশু ও বিনয়ের সাথে দু‘আ করা সহজ হয়। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক প্রদান করুন।

(ছ) শুক্রবারের দিনের ও রাত্রের বিশেষ মুহূর্ত

শুক্রবারের দিনে একটি বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে যে সময়ে বান্দা আল্লাহর নিকট যা প্রার্থনা করবে তাই আল্লাহ তাকে দিবেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ

“নিশ্চয় শুক্রবারে একটি সময় আছে, যে সময় কোনো মুসলিম দাঁড়িয়ে সালাতরত অবস্থায় আল্লাহর কাছে যে

কোনো কল্যাণ প্রার্থনা করবে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে তা প্রদান করবেন।”[৪]

এই মুহূর্তটি রাসূলুল্লাহ (সা.) নির্ধারণ করে দেন নি। সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্য থেকে অধিকাংশ আলিমই বলেছেন যে, শুক্রবারের দিন সূর্যাস্তের পূর্বের মুহূর্ত দু‘আ কবুলের সময়। এ সময়ে যদি কোনো মুসলিম মাগরিবের সালাতের প্রস্তুতি নিয়ে সালাতের অপেক্ষায় বসে দু‘আয় মশগুল থাকে তবে আল্লাহ তাঁর দু‘আ কবুল করবেন। অন্য অনেকে বলেছেন যে, ইমামের খুতবা প্রদান শুরু করা থেকে তাঁর সালাতের সালাম ফেরানো পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই এই মুহূর্তটি রয়েছে।[৭]

২৮. দু‘আ কবুলের স্থানের দিকে লক্ষ্য রাখা

দু‘আ সম্পর্কিত সকল হাদীস পাঠ করলে একটি বিশেষ বিষয় লক্ষ্য করা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর উম্মতকে দু‘আর আদব, নিয়ম, পদ্ধতি, শব্দ ইত্যাদি সব শিক্ষা দিয়েছেন। কখন কী-ভাবে দু‘আ করলে আল্লাহ কবুল করবেন তা বিস্তারিত শিক্ষা দিয়েছেন তিনি।

দু‘আ কবুলের সময় সম্পর্কে আমরা অনেক হাদীস দেখতে পাই। কিন্তু দু‘আ কবুলের স্থান সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা আমরা পাই না বললেই চলে। আমরা অনেক হাদীসে দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) শেষ রাত্র, সালাতের পরে, আযানের পরে ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ে দু‘আ করার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। কিন্তু “অমুক স্থানে গিয়ে দু‘আ কর” এরূপ কোনো নির্দেশনা আমরা কোনো হাদীসে পাই না। শুধুমাত্র হজ্ব ও আল্লাহর ঘর কেন্দ্রিক কয়েকটি হাদীসে পাওয়া যায়, যেগুলির মধ্যে অনেকগুলিই যয়ীফ বা দুর্বল। এ সকল হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, বাইতুল্লাহর দরজার কাছে মুলতাযামে, সাফা ও মারওয়ার উপরে, তাওয়াফের সময়, আরাফাতের মাঠে দু‘আ করা উচিত। এ সকল স্থানের দু‘আ আল্লাহ কবুল করবেন। এছাড়া দু‘আর স্থান নির্দেশ করে কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। সম্ভবত এর কারণ ইসলাম সকল যুগের সকল দেশের মানব জাতির জন্য আল্লাহর মনোনিত বিধান। সকল যুগের সকল স্থানের মানুষই ইচ্ছা করলে সহজেই দু‘আর জন্য মুবারক সময়গুলির সুযোগ নিতে পারবেন। কিন্তু দু‘আ কবুলের কোনো বিশেষ স্থান থাকলে হয় সেখানে যাওয়া অনেকের জন্য সম্ভব হতো না। এজন্য আল্লাহর তাঁর সকল বান্দার জন্য দু‘আ দরজা খুলে দিয়েছেন।

এখানে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় যে, আমাদের দেশের অগণিত মুসলিম আল্লাহর কাছে দু‘আ করার জন্য অগণিত সহীহ হাদীসে নির্দেশিত সময়ের প্রতি কোনো লক্ষ্য রাখেন না। কিন্তু তারা দু‘আর জন্য “স্থান” খুঁজে বেড়ান। বিশেষত অনেক মুসলমানের বদ্ধমূল ধারণা ওলী বুজুর্গগণের মাযারে যেয়ে আল্লাহর কাছে দু‘আ করলে দু‘আ তাড়াতাড়ি কবুল হয়। এই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ধারণার ফলে মাযারগুলি আজ মুসলিমের ঈমান হরণের মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। মাযারগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ভন্ড ব্যবসায়ীদের জমজমাট ব্যবসা। যেখানে অগণিত সরল মুসলিম টাকা-পয়সা, হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল ইত্যাদির সাথে নিজের ঈমানও রেখে চলে আসেন।

আমরা কবর কেন্দ্রিক দু‘আর শিরক বিষয়ে পরে কিছু আলোচনা করব। এখানে শুধু এতটুকু আমাদের জানতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে একটি হাদীসও বর্ণিত হয়নি যে, কোনো ওলী বুজুর্গের মাযারে গিয়ে নিজের হাজত ও প্রয়োজনের জন্য দু‘আ করলে আল্লাহ সে দু‘আ কবুল করবেন। একটি হাদীসও নেই এই মর্মে।

আধখানা হাদীসও নেই। কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

“এবং যদি আমার বান্দাগণ আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তবে আমি তাদের নিকটবর্তী। প্রার্থনাকারী যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে (আমাকে ডাকে) তখন আমি তার ডাকে সাড়া দি (প্রার্থনা কবুল করি)।”[10]

আল্লাহ বললেন তিনি কাছে আছেন। ডাকলেই সাড়া দেবেন। আর আপনি তাঁর কথা বিশ্বাস না করে আর কোথায় দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। কেন দৌড়াচ্ছেন? রাসূলুল্লাহ (সা.) কি কখনো কোথাও বলেছেন যে, কোনো ওলী বা বুজুর্গের কবরে বা মাযারে যেয়ে দু‘আ করলে তা কবুল হবে? কোথাও বলেননি। কাজেই আপনার অস্থিরতা মূলত মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) ওয়াদা ও শিক্ষার প্রতি আপনার অবিশ্বাস। রাসূলুল্লাহ (সা.) উম্মতকে দু‘আর সকল নিয়ম ও আদব শিখিয়ে গেলেন, অথচ এ কথাটি শিখালেন না! সাহাবীগণ প্রশ্ন করেছেন, কিভাবে দু‘আ করলে আল্লাহ কবুল করবেন। তিনি বিভিন্ন সময়, পদ্ধতি ও বাক্য শিখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কখনো ঘুণাক্ষরেও বলেননি যে, ওলী আওলিয়ার মাযারে বা কবরে যেয়ে দু‘আ করলে কবুল হবে। বরং তিনি বিভিন্ন হাদীসে শুধুমাত্র যিয়ারত অর্থাৎ কবরস্থ ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া ও তার জন্য দু‘আ করা ছাড়া কবরের কাছে অন্য কোনো ইবাদত করতে নিষেধ করেছেন।

সাহাবী-তাবেয়ীগণের যুগের অনেক পরে মানুষের মধ্যে বুজুর্গগণের কবরের নিকট দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে নিজের হাজত প্রয়োজন প্রার্থনার রীতি ক্রমান্বয়ে দেখা যেতে থাকে। ইসলামী শিক্ষার অভাব, কুসংস্কার ও জনশ্রুতির উপর বিশ্বাস ইত্যাদি ছিল এর কারণ। জনশ্রুতি আছে - অমুক বুজুর্গের কবরের কাছে দু‘আ করলে তা কবুল হয়। ওমনি কিছু মানুষ ছুটলেন সেখানে দু‘আ করতে। পরবর্তী যুগের অনেক জীবনী গ্রন্থে এমন অনেক জনশ্রুতির কথা পাবেন। সরলমনা অনেক আলিম ও নেককার মানুষও এসকল বিষয়ে জড়িয়ে গিয়েছেন।

প্রিয় পাঠক, আপনি আপনার প্রেমময় প্রতিপালকের কাছে দু‘আ করছেন। যিনি তাঁর মহান রাসূলের (সা.) মাধ্যমে দু‘আর সময় ও নিয়ম শিখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর রহমতে অবিশ্বাস করে ও তাঁর রাসূলের (সা.) শিক্ষায় অনাস্থা এনে মনগড়া ধারণার ভিত্তিতে কোথাও দৌড়ে বেড়াবেন না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) শিক্ষার মধ্যে নিরাপদে অবস্থান করুন। আর কোনো কিছুরই আপনার প্রয়োজন নেই।

(গ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা পরিত্যাগের পরিণাম

উপরের হাদীসগুলি থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, দু‘আ করা আল্লাহর নির্দেশ, তাঁর রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ। দু‘আ করা ইবাদত। দু‘আ না করা অক্ষমতা, অপরাধ ও আল্লাহর ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা বা দু‘আ না করার তিনটি অবস্থা ও পর্যায় রয়েছে। আমরা নিচে এই তিনটি অবস্থার আলোচনা করছি। আল্লাহর তাওফীকই আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল।

প্রথম অবস্থা, আল্লাহর যিকরের কারণে দু'আ পরিত্যাগ যদি কেউ দু'আর বদলে অনবরত আল্লাহর যিকরে নিমগ্ন থাকেন তাহলে তা দু'আর মতোই ইবাদত ও আত্মসমর্পণ হিসেবে আল্লাহর দরবাবে কবুল হবে বলে হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি। যয়ীফ একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, উমার (রাঃ) বা জাবির (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ বলেছেনঃ

من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين

"আমার যিকরে ব্যস্ত থাকার কারণে যে ব্যক্তি আমার কাছে চাইতে পারেনি, আমি প্রার্থনাকারীদের যা প্রদান করি তাঁকে তার চেয়ে উত্তম (পুরস্কার) প্রদান করি।"[11]

অন্য হাদীসে আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)বলেন, আল্লাহ বলেন:

من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين

"যাকে কুরআন ও আমার যিকর আমার নিকট প্রার্থনা থেকে ব্যস্ত রাখে আমি প্রার্থনাকারীদের যা প্রদান করি তাঁকে তার চেয়ে উত্তম (পুরস্কার) প্রদান করি।"[12]

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, সকল দু'আই যিকর। তবে সকল যিকর দু'আ নয়। বিভিন্ন বাক্যে নিজের জন্য কিছু না চেয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর মর্যাদা প্রকাশ করা দু'আ বিহীন যিকর। অনেক সময় বান্দা বিপদে আপদে মন-প্রাণ আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে শুধু তাঁর যিকর করতে থাকেন। এই যিকরই তার দু'আ। এই যিকর দু'আ-পরিত্যাগ নয়। বরং অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের দু'আ। এই যিকরের কারণেই আল্লাহ তার বিপদ কাটিয়ে দিবেন। কুরআনে আল্লাহ জানিয়েছেন যে, নবী ইউনূস (আ.) মাছের পেটের মধ্যে ভয়ঙ্করতম বিপদে পড়ে আল্লাহর কাছে সকাতরে প্রার্থনা করেছিলেনঃ (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, আপনি পবিত্র, মহান!আমি তো সীমালংঘনকারী।"

এখানে আমরা দেখছি যে, কোনো প্রার্থনা নেই, শুধুমাত্র যিকর। কিন্তু আল্লাহ এই যিকরকেই দু'আ বা নিদা অর্থাৎ আহবান নামে অভিহিত করেছেন এবং তার আহবানে সাড়া দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। তার কারণ এই আকুতিময় যিকরই দু'আ। আর উপরের হাদীসে এধরনের যিকরের কথা বলা হয়েছে। আমরা ইতঃপূর্বে ইসমু আযম বিষয়ক আলোচনায় দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ "ইউনূস (আঃ)-এর এই দু'আ পড়ে যে কোনো মুসলিম যে কোনো বিষয়ে দু'আ করলে আল্লাহ তার দু'আ কবুল করবেন ও প্রার্থনা পূরণ করবেন।"[13]

যিকর নং ২৮ : (يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ)

উচ্চারণঃ ইয়া 'হাইয়্যু, হয়া ক্বাইয়্যুম। অর্থঃ হে চিরঞ্জীব, হে সর্বসংরক্ষক।

আলী (রাঃ) বলেনঃ

لما كان يوم بدر قاتلت شيئاً من قتال ثم جئت مسرعاً لأنظر ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت

فإذا هو ساجد يقول: يا حيّ يا قيّوم يا حيّ يا قيّوم لا يزيد عليهما ثم رجعت إلى القتال ثمّ جئت وهو ساجد يقول ذلك ثم ذهبت إلى القتال ثم رجعت وهو يقول ذلك ففتح الله عليه

“বদরের যুদ্ধের দিনে আমি কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) কি করছেন তা দেখার জন্য তাড়াহুড়ো করে ফিরে আসলাম। এসে দেখি তিনি সাজাদা রত অবস্থায় রয়েছেন এবং শুধু বলছেনঃ ‘ইয়া হাইউ ইয়া কাইউম’ (হে চিরঞ্জীব, হে সর্বসংরক্ষক), এর বেশি কিছুই বলছেন না। অতঃপর আমি আবার যুদ্ধের মধ্যে ফিরে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার আসলাম। দেখি তিনি সাজদা রত অবস্থায় ঐ কথাই বলছেন। এরপর আমি যুদ্ধে ফিরে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে আসলাম। এসে দেখি তিনি ঐ কথাই বলছেন। এরপর আল্লাহ তাঁকে বিজয় দান করেন।” হাফিয হাইসামী হাদীসটির সনদ হাসান বলে উল্লেখ করেছেন।[14]

এ হাদীসেও আমরা দেখছি, কিভাবে যিকরের মাধ্যমে দু‘আ করা হয়। এইরূপ সমর্পিত যিকর সর্বোত্তম দু‘আর ফল এনে দেয়।

যিকর নং ২৯ : দুশ্চিন্তা বা বিপদগ্রস্তের দু‘আ-১

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বিপদ বা কষ্টের সময় বলতেনঃ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

উচ্চারণঃ লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল আযীমুল হালীম, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রাব্বুল আরশিল আযীম, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা- হু রাব্বুস সামাওয়া-তি ওয়া রাব্বুল আরদি ওয়া রাব্বুল আরশিল কারীম।

অর্থঃ “নেই কোনো মা’বুদ আল্লাহ ছাড়া, যিনি মহান, মহাধৈর্যময় মহা বিচক্ষণ, নেই কোনো মা’বুদ আল্লাহ ছাড়া, যিনি মহান আরশের প্রভু, নেই কোনো মা’বুদ আল্লাহ ছাড়া, যিনি আসমানসমূহের, জমিনের ও সম্মানিত আরশের প্রভু।”[15]

আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে কোনো কষ্ট বা বিপদে পড়লে উপরের এই দু‘আ পড়তে শিখিয়েছেন।[16] এখানে আমরা দেখছি যে, এই দু‘আ মূলত শুধুমাত্র যিকর। এখানে কোনো দু‘আ নেই। কিন্তু আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে তার কাছে আত্মসমর্পণ করেই দু‘আ করা হচ্ছে।

যিকর নং ৩০ : দুশ্চিন্তা বা বিপদগ্রস্তের দু‘আ-২

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর পরিবারের সবাইকে একত্রিত করে বলতেন: “তোমাদের কেউ কখনো দুশ্চিন্তা বা বিপদের মধ্যে নিপতিত হলে বলবেঃ

اللَّهُ، اللَّهُ رَبِّى لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اللَّهُ اللَّهُ رَبِّى لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

উচ্চারণঃ আল্লা-হু, আল্লা-হু রাব্বী, লা- উশরিকু বিহী শাইআন। আল্লা-হু, আল্লা-হু রাব্বী, লা- উশরিকু বিহী

শাইআন।

অর্থঃ “আল্লাহ, আল্লাহ, আমার রব, তার সাথে কাউকে শরীক করি না, আল্লাহ, আল্লাহ, আমার রব, তার সাথে কাউকে শরীক করি না।”

হাদীসটির সনদ কিছুটা দুর্বল হলেও অন্যান্য কয়েকটি সনদে একই দু’আ বর্ণিত হয়েছে। এজন্য হাদীসটি হাসান।[17] এই দু’আও মূলত যিকর। বিপদগ্রস্ত মুমিন-হৃদয় এভাবে নিজেকে সমর্পণ করে আল্লাহর করুণা সন্ধান করেন।[18]

দ্বিতীয় অবস্থা, আল্লাহ জানেন বলে বা তাওয়াক্কুল করে দু’আ পরিত্যাগ আল্লাহ দেখছেন বলে দু‘আ না করা বা আল্লাহর তাকদীরের উপর নির্ভর করে দু‘আ থেকে বিরত থাকা কঠিন অপরাধ ও সুন্নাত বিরোধী কর্ম। সকল বিষয়ে আল্লাহর কাছে চাওয়া বা প্রার্থনা করা আল্লাহর নির্দেশ, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত এবং একটি অতিরিক্ত ইবাদত। সুন্নাতের আলোকে আমরা একটি ঘটনাও খুঁজে পাব না, যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা.) দু‘আ না করে তথাকথিত ‘তাওাক্কুল’ করেছেন। অথবা আল্লাহ তো আল্লাহ আমার অবস্থা দেখছেন কাজেই দু‘আর কী দরকার? - একথা বলে দু‘আ করা থেকে বিরত থেকেছেন এমন একটি ঘটনাও আমরা খুঁজে পাব না।

মুহতারাম পাঠক, সাহাবীগণের যুগের পর থেকে, অনেক বুজুর্গ ও নেককার মানুষের ঘটনা আপনি বিভিন্ন গ্রন্থে পাবেন, যেখানে তাঁরা বিপদে আপদে দু‘আ করেননি। দু‘আ করতে বলা হলে তাঁরা বলেছেন, “আল্লাহ তো আমার অবস্থা দেখছেন, অথবা আল্লাহ্ই আমার বিপদ দিয়েছেন আমি কেন তাঁর কাছে বিপদ কাটাতে বলব, ইত্যাদি।” কেউ হয়ত বলেছেন, দু‘আর চেয়ে তাওয়াক্কুলই উত্তম।

এ সকল বুজুর্গের কর্ম, কারামত ও ঈমানের এই দৃঢ়তা দেখে আমরা বিমোহিত হয়ে মনে করি এই বুঝি ঈমানের ও তাওয়াক্কুলের সর্বোচ্চ স্তর! এই সময়ে আমরা ভুলে যাই যে, ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর। তার পরেই তাঁর সাহাবীগণ। আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের একটি ঘটনাও পাব না যে, তিনি কখনো কোনো সমস্যায়, বিপদে বা প্রয়োজনে দু‘আ না করে তাওয়াক্কুল করেছেন। তিনি সর্বদা দু‘আ করেছেন ও দু‘আ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। দু‘আই ইবাদত, দু‘আই তাওয়াক্কুল এবং দু‘আই ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর। উপরিউক্ত বুজুর্গগণের স্তর এর নিচে। তাঁরা কবলবের বিশেষ হালতে এসকল কথা বলেছেন। তাঁদের হালতের চেয়ে উচ্চ হালত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এবং তার পরে তাঁর সাহাবীগণের হালাত।

ইবাদত, বন্দেগি, নির্জনবাস, যিকর আযকার ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে আমাদের এই বিষয়টি খুব বেশি মনে রাখতে হবে। অগণিত বুজুর্গের অগণিত আকর্ষণীয় বিবরণ আমরা দেখতে পাব। এগুলি হয়ত ভালো। তবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শই অনুকরণীয় আদর্শ।

বানোয়াট একটি গল্প আমাদেরকে ভুল বুঝতে সাহায্য করে। এই ঘটনায় বলা হয়েছে: ইবরাহীমকে (আ.) যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয় তখন জিবরাঈল (আঃ) এসে তাঁকে বলেনঃ আপনার কোনো প্রয়োজন থাকলে আমাকে বলুন। তিনি বলেন, আপনার কাছে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। জিবরাঈল (আ.) বলেন, তাহলে আপনি আপনার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন। তখন ইবরাহীম (আ.) বলেনঃ

حسبي من سؤالي علمه بحالي

“তিনি আমার অবস্থা জানেন, এটাই আমার জন্য যথেষ্ট, অতএব আমার আর কোনো প্রার্থনার প্রয়োজন নেই।”

এই কাহিনীটি ভিত্তিহীন বানোয়াট কথা। ইহুদিদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী, সনদহীনভাবে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। কুরআন কারীমে ইবরাহীমের অনেক দু'আ উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি কখনো কোনো প্রয়োজনে দু‘আ করেননি এরূপ কোনো ঘটনা কুরআন বা হাদীসে বর্ণিত হয়নি।[19]

সর্বোপরি দু'আ পরিত্যাগ করা কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার বিপরীত। উপরের বিভিন্ন হাদীসে দু‘আ করার নির্দেশ আমরা দেখেছি। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সকল বিষয় আল্লাহর কাছে চাইতে হবে তাও দেখেছি। উপরন্তু না চাইলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। আবু হুরাইরা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ

من لم يدع الله غضب الله عليه

“কেউ আল্লাহর কাছে না চাইলে বা দু'আ না করলে আল্লাহ তার উপর ক্রোধান্বিত হন।” হাদীসটি হাসান বা গ্রহণযোগ্য।[20]

আমরা দেখেছি যে, কুরআন করীমে আল্লাহর কাছে দু'আ না করার ভয়ঙ্কর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেনঃ “এবং তোমাদের প্রভু বললেনঃ তোমরা আমার কাছে প্রার্থনা করা আমি তোমাদের প্রার্থনায় সাড়া দিব। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদত থেকে অহঙ্কার করে তারা লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” আমরা দেখেছি যে, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ দু'আই ইবাদত। আল্লাহর কাছে দু'আ না করাই আল্লাহর ইবাদত থেকে অহঙ্কার করা।

তৃতীয় অবস্থা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে দু‘আ

আল্লাহর কাছে দু'আ না করার সর্বশেষ অবস্থা আল্লাহর কাছে দু'আ না করে অন্যের কাছে দু‘আ করা। বিশেষ বিপদে বা বড় বড় সমস্যায় আল্লাহর কাছে দু'আ চাওয়া। বাকি ছোটখাট বা সাধারণ বিপদ আপদ, সমস্যা, হাজত, প্রয়োজন ইত্যাদির জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করা। এই অবস্থা শির্কের অবস্থা ও ভয়ঙ্করতম ধ্বংসের কারণ।

ফুটনোট

[1] সুনানু আবী দাউদ ১/২৫৪, নং ৯৬৯, মুসতাদরাক হাকিম ১/৩৯৭, মাওয়ারিদুয যামআন ৮/৭৪, জামিউল উসূল 8/২০৫-২০৬।

[2] ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, আল-মাবসূত ১/২০২-২০৩।

[3] বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ২/২০৪, ২১০, ২১১, নাসিরুদ্দিন আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ২/১৭০।

[4] ইমাম মুহাম্মাদ, আল-মাবসূত ১/১৬৪।

[5] ইমাম মুহাম্মাদ, আল-হুজ্জাত, পৃ. ২০২।

[6] সুনানুত তিরমিযী ২/৩২৮, নং ৪৬৪, সুনানুন নাসাঈ ৩/২৪৮, নং ১৭৪৫, সুনানু আবী দাউদ ২/৬৩, নং ১৪২৫, মুসতাদরাক হাকিম ৩/১৮৮, ৪/২৯৮, সহীহ ইবনু খুযাইমা ২/১৫১, ১৫২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/২২৫, বাইহাকী আস-সুনানুল কুবরা ২/২০৯, তাবারানী, আল-কাবীর ৩/৭৩-৭৪, যাইলাঈ, নাসবুর রাইয়াহ ২/১২৫, ইবনু হাজার, তালখীসুল হাবীর ১/২৪৯, আযীমাবাদী, আনুল মা'বূদ ৪/২১২।

[7] দেখুনঃ এহইয়াউস সুনান, পৃ. ২৫১-২৫২।

[8] সহীহ বুখারী ৫/২০২৯, নং ৪৯৮৮, সহীহ মুসলিম ২/৫৮৪, নং ৮৫২, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে।

[9] দেখুনঃ শাওকানী, তুহফাতুয যাকিরীন বি উদ্দাতি হিসনীল হাসীন, পৃ. ৪০-৪১।

[10] সূরা বাকারাঃ ১৮৬।

[11] ইমাম বুখারী, খালকু আফআলিল ইবাদ, পৃ. ১০৯, মুসনাদুল বাযযার ১/২৪৭, মুসান্নাফু ইবনু আবী শায়বা ৬/৩৪, মুসনাদুশ শিহাব ১/৩৪০, ২/২৩৬, বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ১/৪১৩, ৪১৪, ৩/৪৬৭, ফাতহুল বারী ১১/১৩৪, ১৪৭, ১৩/৪৮৯। হাদিসটির সনদ দুর্বল।

[12] তিরমিযী ৫/১৪৮, নং ২৯২৬।

[13] সুনানুত তিরমিযী ৫/৫২৯, নং ৩৫০৫, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৮৪, ৬৮৫, মাজমাউয যাওয়াইদ ৭/৬৮।

[14] মুসতাদরাক হাকিম ১/৩৪৪, মুসনাদুল বাযযার ২/২৫৪, নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমি, পৃ. ৩৯৭, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১৪৭।

[15] সহীহ বুখারী ৫/২৩৩৬, নং ৫৯৮৫, ৫৯৮৬, সহীহ মুসলিম ৪/২০৯২, নং ২৭৩০।

[16] সহীহ। সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/১৪৭, মুসনাদ আহমাদ ১/৯৪, মাওয়ারিদুয যাম'আন ৭/৪০৩-৪০৪।

[17] মাওয়ারিদুয যাম'আন ৭/৪০০-৪০১।

[18] ফাতহুল বারী ১১/১৪৬-১৪৭।

[19] ইবনু ইরাক, তানযীহুশ শারীয়াহ ১/২৫০, আলজূনী, কাশফুল খাফা ১/১৩৬, আলবানী সিলসিলাতুয যয়ীফাহ ১/৭৪-৭৬, নং ২১।

[20] সুনানু ইবনু মাজাহ ২/১২৫৮, নং ৩৮২৭, আলবানী, সহীহু সুনানু ইবনু মাজাহ ৩/২৫২, মুসনাদু আহমাদ ২/৪৪৩, ২/৪৪৭, মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা ৬/২২, তুহফাতুল আহওয়াযী ৯/২২১, শারহুয যারকানী ২/৪৪।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8751

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন